সংবাদ

তারিখ ... 17 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭ ...

আগামীর শিক্ষক ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম : বেতন পদোন্নতি

এমএম রহমান

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক ১০ম গ্রেডে বেতন পেয়ে থাকেন। সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির সুযোগ পেয়ে থাকেন মাত্র ৪ থেকে ৫ শতাংশ শিক্ষক। ৮ম পে স্কেলে সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল বাতিল করায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক সারাজীবনে সর্বোচ্চ দুটি গ্রেড উন্নয়নের সুযোগ পেয়ে সর্বোচ্চ ৮ নম্বর গ্রেডে যেতে পরবেন। আর বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি কলেজ পর্যায়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে বেছে বেছে অযোগ্যদের নিয়োগের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ও উৎসব ভাতা যথার্থ হারে পান না। এমপিও বা মানথলি পেমেন্ট অর্ডারের আওতায় যে অর্থ বেতন হিসেবে দেয়া তা সব সময় শিক্ষকরা সময় মত পান না।

সরকারি কলেজ শিক্ষকরা ৫২ দিন সাপ্তাহিক ছুটিসহ বছরে ১২৮ দিন ছুটি পাবেন বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত ছুটির তালিকায় বলা হয়েছে। অথচ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত বার্ষিক ছুটির ক্যালেন্ডারে দেখা যাচ্ছে ১০৪ দিন সাপ্তাহিক ছুটিসহ সাধারণ ছুটি, নির্বাহী আদেশে ছুটি ও ঐচ্ছিক ছুটিসহ অনবকাশ বিভাগের একজন কর্মকর্তা বছরে ১৩১ দিন ছুটি পেয়ে থাকেন। তারপরও অন্যায্যভাবে শিক্ষকদের অবকাশ বিভাগ বলে চিহ্নিত করে অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ: হজব্রত পালন করতে গেলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের একজন শিক্ষক ঐ সময়ে অর্ধেক বেতন পাবেন। অথচ একই বিসিএস ব্যাচের অন্য ক্যাডার সদস্যরা এইক্ষেত্রে পূর্ণ বেতন পাবেন। একই কারণে অবসরকালীন সুবিধাও শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তারা কম পেয়ে থাকেন। শিক্ষকরা গ্রীষ্মকালীন ছুটি ও অন্যান্য ছুটির মধ্যে পরীক্ষা নেন এবং কর্মদিবসের ন্যায় কলেজে যান। যেমন: গ্রীষ্মকালীন ছুটির মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, শীতকালীন ছুটি, ঈদ-রোজার ছুটির মাঝে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা চলে। শহীদ দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি), স্বাধীনতা দিবস (২৬ মার্চ), জাতীয় শোক দিবস (১৫ আগস্ট), বিজয় দিবসে (১৬ ডিসেম্বর) সকল স্তরের শিক্ষকরা যথারীতি স্কুল-কলেজে গিয়ে কার্যদিবসের ন্যায় দায়িত্ব পালন করেন। তাহলে এই দিনগুলো তাদের ছুটির ক্যালেন্ডারে ছুটি হিসেবে দেখানোর দরকার কী? এই কাগুজে ছুটিগুলো বাদ দিলে অবকাশ বিভাগ বলে খ্যাত শিক্ষকদের ৫২ দিন সাপ্তাহিক ছুটিসহ বাৎসরিক ছুটি ১০০ দিনেরও নিচে চলে আসবে যা অনবকাশ বিভাগের থেকে অনেক কম। তারপরও শিক্ষা বিভাগকে অবকাশ বিভাগ বলে তার গড়-বেতনে অর্জিত ছুটি থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই অন্যায় শিক্ষক সম্প্রদায়ের জন্যে অসম্মানেরও বটে। এই কারণে মেধাবীরা শিক্ষা ক্যাডারে আসতে চান না।

দেশে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে সরকারি কলেজগুলোতে। কিন্তু সেই সরকারি কলেজ শিক্ষকদের মর্যাদার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সরকারের লিখিত মর্যাদা তালিকায় (ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স, পরিমার্জন ৭ জানুয়ারি ২০০৮) সরকারি কলেজের প্রভাষক থেকে অধ্যক্ষ, আর একজন সুইপার থেকে পিয়ন- সবাই একই মর্যাদার অধিকারী। অর্থাৎ রাষ্ট্র রাষ্ট্রস্বীকৃত ২৫ স্তরের মর্যাদা তালিকায় শিক্ষাবোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানসহ কেউ রাষ্ট্রস্বীকৃত মর্যাদার অধিকারী নন। আর্থিক বিবেচনাতেও তারা বঞ্চিত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও প্রকৌশল/কারিগরি কলেজের অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকগণ জাতীয় বেতন স্কেলে যথাক্রমে ৩য় ও ৪র্থ গ্রেডে বেতন পেলেও সরকারি কলেজের অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকগণ বেতন পেয়ে থাকেন যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম গ্রেডে। অর্থাৎ, তারা এক গ্রেড নিচে বেতন পেয়ে থাকেন। বিসিএস প্রশাসনসহ অন্য ক্যাডার কর্মকর্তাগণ ৫ম গ্রেড থেকে সরাসরি ৩য় গ্রেডে পদোন্নতি পেলেও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাগণ পেয়ে থাকেন ৫ম থেকে ৪র্থ গ্রেডে। এসব কলেজ শিক্ষকগণ বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা হলেও বেতন স্কেলের ১, ২, ৩ নম্বর গ্রেড কখনো পাবেন না। আগে সিলেকশন গ্রেড পেলে একজন অধ্যাপক ৩য় গ্রেড পর্যন্ত যেতে পারতেন যদিও অধ্যাপকদের সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তি ছিল অত্যন্ত বিরল ঘটনা। এটা শিক্ষা ক্যাডারের প্রতি মেধাবীদের তীব্র অনীহার অন্যতম একটি কারণ। ৮ম পে-স্কেলে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেল বাতিল করায় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা কাডারে বেতন গ্রেড উন্নয়নে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে। আগে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাগণ চাকরির ৪র্থ বছরে ৭ম গ্রেডে, ১০ম বছরে ৫ম গ্রেডে আর ১৮শ বছরে ৪র্থ গ্রেডে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পেতেন। পদোন্নতি প্রক্রিয়া অত্যন্ত বিলম্বিত হওয়াতে এখন চাকরির ৪র্থ বছরের পরিবর্তে ১১ বছরে গ্রেড উন্নয়ন ঘটবে (যেহেতু সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ৫ বছরে প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়ার কথা থাকলেও অনেক শিক্ষক ১০ বছরেও এই পদোন্নতি পান না। ফলে তারা চাকরি ১১শ বছরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী গ্রেডে (৭ম) উন্নীত হবেন। আগে ১০ বছরে যে শিক্ষক ৫ম গ্রেড পেতেন এখন তাদের অনেকেই ২৫/২৬ বছরে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেলেই কেবল তা পাবেন। কারণ, বিষয়ভেদে অনেক শিক্ষক ২৫/২৬ বছরে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে থাকেন যা জীবনের ২য় পদোন্নতি। চাকরির ১৮শ বছর পূর্তিতে যে ৪র্থ গ্রেড পেতে তা এখন সারাজীবনেও অনেক পাবেন না। সৌভাগ্যবানরা কেউ কেউ হয়ত চাকরি ২/১ বছর থাকতে পাবেন। কারণ শুধু অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেলেই কেবল একজন শিক্ষা ক্যাডার অফিসার ৪র্থ গ্রেডে উন্নীত হবেন যা অনেক শিক্ষকের জীবনে কখনোই ঘটে না। স্বয়ংক্রিয় গ্রেড পরিবর্তন শিক্ষা ক্যাডারের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না। কারণ, এটা মাত্র ২ বার পাওয়ার কথা থাকলেও বিশেষ শর্তের কারণে কেউ কেউ এটা একবারও পাবেন না। সিলেকশন গ্রেড ও টাইম-স্কেল বাতিল করার ফলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের প্রতি মেধাবীদের আগ্রহ শূন্যের কোটায় নেমে আসবে। যোগ্যতাসম্পন্নরা আর কলেজ শিক্ষকতায় আসবেন না।

দেশের সরকারি কলেজগুলোতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে যা মেধাবীদের এই পেশায় আসতে অনুৎসাহিত করছে। কোন রকম যোগ্যতার ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও বিসিএস ব্যাচ বিবেচনায় জুনিয়র কর্মকর্তারা আগে পদোন্নতি পেয়ে সিনিয়রদের বস হয়ে বসছেন। যেমন: ১৯৯৬ সালে ১৬তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে যোগদানকারী অনেক শিক্ষক এখনো সহকারী অধ্যাপক (৬ষ্ঠ গ্রেড) আবার এর ৯ বছর পরে ২০০৫ সালে ২৪তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে যোগদানকরী অনেক শিক্ষক এখন সহযোগী অধ্যাপক (৫ম গ্রেড)। কোন যোগ্যতা বা দক্ষতার অভাব না থাকা সত্ত্বেও ৯টি ব্যাচ আর ৯ বছরের জুনিয়র কোন কর্মকর্তা যার বস সেই জানে এই লজ্জা কত গভীর আর সুতীব্র বেদনার। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা হলো, বিশেষ বিষয়ে (বাংলা) পদ খালি থাকাতে ২৪তম বিসিএস ব্যাচের কর্মকর্তারা সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন আর পদ শূন্য না থাকাতে ১৬ বিসিএস ব্যাচের (দর্শন, রসায়ন, ইসলামী শিক্ষা ইত্যাদি) অনেকেই এখনো পদোন্নতি পাননি। কিন্তু কোন বিষয়ে পদ খালি থাকাটা যেমন কোন কর্মকর্তার যোগ্যতা আর মেধার পরিচয় বহন করে না; তেমনি কোন বিষয়ে পদ শূন্য না থাকাটাও কোন কর্মকর্তার অযোগ্যতা হতে পারে না। পদ শূন্য না থাকার জন্য একজন কর্মকর্তা দায়ী নন। তাহলে একজন কর্মকর্তা কেন অযোগ্য বা দোষী না হওয়া সত্ত্বেও তার খসারত দিবেন?

শিক্ষকদের কাজের ধরন ও প্রকৃতি বিবেচনায় নিলে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হল বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে পারসোনাল প্রমোশন পদ্ধতি চালু করা (অধিকাংশ সরকারি কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় অনার্স-মাস্টার্স শ্রেণীতে পাঠদান করা হয়ে থাকে)। এখানে প্রভাষক থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত সবাই একই অফিসে (বিভাগীয় অফিস) বসেন এবং একই ধরনের কাজ করে থাকেন (পাঠদান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ইত্যাদি)। তাই যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে কোন একটা কলেজে সবাই যেমন অধ্যাপক হতে পারেন, তেমনি সবাই প্রভাষকও হতে পারেন। অর্থাৎ সরকারি কলেজগুলোতে মেধাবীদের আকৃষ্ট করতে হলে পদবিভিত্তিক পদ সংখ্যা তুলে দিতে হবে যেখানে ব্যক্তি যোগ্যতা অর্জন করলে পদোন্নতি পাবেন যার জন্য পদবিভিত্তিক শূন্য পদের পরিবর্তে শুধু শূন্য পদ থাকলেই চলবে। পদবি-নিরপেক্ষ পদ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে পদের সংখ্যা নির্ধারিত থাকলেও পদবি উন্মুক্ত থাকবে। ফলে পদবিভিত্তিক শূন্য পদের আর প্রয়োজন হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে পারসোনাল প্রমোশন পদ্ধতি চালু করার ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, ক্যাডার সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত থেকে শিক্ষা শুধু ক্যাডারের পদগুলোকে পদবি-নিরপেক্ষ করা যাবে না। কারণ অন্যান্য কাডারে এ ধরনের নজির নেই এবং এতে ক্যাডার সার্ভিসের মাঝে সমতা নষ্ট হবে। কিন্তু কাজের প্রকৃতি ও ধরন বিবেচনায় সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্যাডারের মাঝে আসলেই কি সমতা আছে? সুযোগ-সুবিধা, কর্মঘণ্টা, পদোন্নতি, পদসোপান, ইত্যাদি বিবেচনায় বিভিন্ন ক্যাডারের মাঝে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। শিক্ষা কাডারে শূন্যপদে পদোন্নতির ধারণাটি অন্য ক্যাডারের সাথে মিল করে সঙ্গতি রাখা হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্যাডারের সাথে সঙ্গতি বজায় রাখা হয়নি। অতএব, সকল ক্যাডারের মাঝে সবক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা হয়, এই কথাটি সঠিক নয়। যেমন : প্রশাসন ক্যাডারসহ অনেক ক্যাডার কর্মকর্তারা সরকারি গাড়ি-বাড়ি, বেয়ারা, পিয়ন, প্রহরী পেয়ে থাকেন যা শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য করা হয়নি। আবার শূন্য পদে পদোন্নতির ধারণাও বাস্তবে সবক্ষেত্রে কার্যকর নয়। যেমন: গত এপ্রিল মাসে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশে ৮৩০টি উপসচিব পদের বিপরীতে উপসচিব কর্মরত ১৬২৩ জন, ৪৩০টি যুগ্মসচিব পদের বিপরীতে যুগ্মসচিব কর্মরত ১১৬৬ জন এবং ১০৭টি অতিরিক্ত সচিব পদের বিপরীতে অতিরিক্ত সচিব কর্মরত ৪৫৭ জন (সূত্র: banglamail24.com, ১৮ এপ্রিল ২০১৫)। শূন্যপদভিত্তিক পদোন্নতির ধারণাটি প্রশাসনসহ অন্য ক্যাডারের জন্য প্রযোজ্য হলেও শিক্ষা ক্যাডারের জন্য প্রযোজ্য করা উচিত হয়নি। কারণ, অন্যান্য ক্যাডারের ক্ষেত্রে পদোন্নতির সাথে সাথে কর্মের অধিক্ষেত্র, কাজের ধরন ও প্রকৃতি পরিবর্তন হয় যা শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ঘটে না। সেখানে পদবির সাথে কর্মক্ষেত্রও নির্ধারিত। যেহেতু এসব ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র পদবিভিত্তিক তাই সেখানে নির্ধারিত কর্মক্ষেত্রের থেকে বেশি পদে পদোন্নতি দেয়া সম্ভব নয়। যেমন: ৩০০ অতিরিক্ত সচিবকে সচিব পদে পদোন্নতি দেয়া সম্ভব নয় কারণ দেশে ৩০০ সচিবের কর্মক্ষেত্রই নেই। আবার ২০০/৩০০ জেলা প্রশাসক নিয়োগ দেয়া সম্ভব নয় কারণ দেশে ২০০/৩০০ জেলা নেই। কিন্তু দেশের সকল কলেজ শিক্ষককে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দিলেও তারা একই কর্মক্ষেত্রে একই কাজ করে যাবেন।

rahmanmm40@gmail.com